মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২৪

বিগত মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তরুণ দর্শনার্থীর সংখ্যাই বেশি

সময় কারো জন্যে থেমে থাকে না প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে চলতে থাকে। গত জুলাই-আগস্টের অস্থির সময় পেরিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক হতে শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে দর্শনার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আগমন। গত কয়েক মাসের প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশের ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আগ্রহ নিয়ে তারা দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, ছয়দফা, ৭০-এর নির্বাচন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেখে। স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক। পাঠ্যপুস্তকের গন্ডি পেরিয়ে আরও জানতে কিংবা জানার আগ্রহ তৈরি করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিকল্প নেই। বি এফ শাহীন কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভ সাতবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার আগ্রহ থেকে বারবার এখানে আসতে তার ভালো লাগে। শুভর মতে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিকল্প নেই। এখানে রাখা স্মারক, ছবি দেখে বই পড়ার চেয়ে বেশি ধারণ করা যায়। এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইতিহাস না জানা থাকলে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক জানতে পারবো না। সঠিক ইতিহাস জানা থাকলে ফেসবুকের রিউমারকে ডিফেন্ড করতে পারবো। ফেসবুকে পোস্ট শেয়ার করার সময় অধিকাংশ মানুষই চেক করে দেখে না তথ্যটি সঠিক কিনা, ভালো লাগলেই শেয়ার করে দেয়। আমি যেহেতু একটু একটু ইতিহাস জানি এজন্য এই কাজটি করি না।' গত একমাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শুভর মতো তরুণদেরই আগমন ঘটেছে বেশি। সবচেয়ে বেশি এসেছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বড় একটা অংশ মাদ্রাসার। কয়েকবছর যাবত মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকেও বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস তাদেরও পড়তে হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, নিজের দেশের ইতিহাস জানে। মো. আবদুস সালাম নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী তার সহপাঠীদের সাথে এসেছে জাদুঘর পরিদর্শনে, তার কাছে মনে হয়েছে বইয়ের বিষয়গুলোসহ সমসাময়িক আরও ঘটনা এখানে এসে বিস্তারিত জানতে পারছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশের ইতিহাস জানার আগ্রহ বাড়ছে এটি সত্যিই আনন্দের।

তরুণদের পাশাপাশি শিশু-বৃদ্ধ সকলেই উৎসাহ নিয়ে জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চারপাশে বেশকিছু সরকারি হাসপাতাল থাকায় দর্শনার্থীদের একটা বড় অংশ আসে রোগীর আত্মীয়স্বজন আর রোগী। এক দুপুরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব আগ্রহ নিয়ে সবকিছু দেখছিলেন। বয়সে হয়তোবা পৌঢ় হবেন কিন্তু জীবনযাপনের

চাপে এই যান্ত্রিক শহরে অকালেই দুরারোগ্যব্যাধী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'ক্যান্সার হইছে, মরার আগে শেষবারের মতো একটু দেইখা যাই কি কষ্ট কইরা মানুষ এই দ্যাশটা স্বাধীন করছে'।

ইয়াছমিন লিসা

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শহীদ কন্যা রওশনারা বেগম

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে যে সকল শহীদের সন্তান নিয়মিত আসেন তাদের মধ্যে রওশনারা বেগম অন্যতম। শহীদ ইসমাইল বেপারীর একমাত্র কন্যা তিনি। শারিরীক অসুস্থতা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। মঞ্চে স্মৃতিচারণ করার সময় অঝরে কাঁদতেন আর বলতেন, আমার বাবা এই দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, আপনারা আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন। আমি অনেক অসুস্থ, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। আমার জন্যও দোয়া করবেন। ওনার কথাগুলো সত্যি হয়ে গেল গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করলেন তিনি। তার শেষ যাত্রায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়েছিলাম বধ্যভূমির সন্তানদলের কয়েকজন সদস্যকে সাথে নিয়ে। রওশন আপার নিথর দেহখানি দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। মুখখানি দেখে তার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে গেল। যখন ওনার বাসায় যেতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র দিতে তখন জল্লাদখানার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সবার খোঁজ করতেন। কতই না ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তিনি নানান আতিথিয়তার জন্য। এখন আর কোন ব্যস্ততা নেই। পৃথিবীর সকল ব্যস্ততা তাকে মুক্তি দিয়েছে। মাথার কাছে তার একমাত্র কন্যা সৃষ্টি নীরবে বসে ছিল। সেও একসময় বধ্যভূমির সন্তানদলের সদস্য ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় তার মা সবসময় তার সঙ্গে যেতেন। কাঁদতে কাঁদতে বধ্যভূমির সন্তানদলের সদস্যদের সে কথাই বলছিল সৃষ্টি।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে রওশনারা বেগম ছিলেন মাত্র দুই বছরের ছোট্ট শিশু। পিতা ইসমাইল বেপারী মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের এ ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ২৫ মার্চ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তার পরিবারের লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেন। পিতা ইসমাইল বেপারী তাদেরকে নিয়ে চলে যান মোহাম্মদপুর এলাকার পাশে আটি গ্রামে। যুদ্ধের পুরো সময়টা তারা সেখানেই ছিলেন। ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানিরা মোহাম্মদপুরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা আটি গ্রামের স্কুল ঘরে অনেক লোকের সাথে ইসমাইল বেপারীকেও ধরে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং সেখানেই তাঁদেরকে গণকবর দেয়। পরে তারা এলাকাবাসীর কাছ থেকে এ খবর পান।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে সংরক্ষিত শহীদদের তালিকায় ১৩ নম্বরে রয়েছে শহীদ ইসমাইল বেপারীর নাম। মায়ের মুখ থেকে শহীদ বাবার অনেক স্মৃতিকথা শুনেছেন তিনি। বাবার শহীদ হওয়ার ঘটনা তিনি জল্লাদখানায় স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচিতে নতুন প্রজন্মকে জানাতেন। শিক্ষার্থীদের সবসময় বলতেন তোমরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদের কথা কখনো ভুলোনা। এই দেশটাকে অনেক ভালোবেসো। তোমরা বাবার আদর পেয়েছো কিন্তু আমি পাইনি। শহীদ বাবার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছি। এভাবেই বেঁচে ছিলেন রওশনারা বেগম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরম সুহৃদ পরপারে ভালো থাকুন। আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তাঁর প্রতি।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

৭১ : ফ্রেম ও ফ্রেমের বাইরে

আলোকচিত্রী নাইব উদ্দিন আহমেদ-এর মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র নিবেদিত ও আহমেদ জাকি পরিচালিত 71:In Frame and Out of Frame একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র। এটি বাংলাদেশী চিত্রগ্রাহক নাইব উদ্দিন আহমেদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর। ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগে প্রধান আলোকচিত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাইব উদ্দিন আহমেদ। এই যোগদান তাঁর জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তথ্য-প্রামাণ্য চিত্রটি। ময়মনসিংহে থাকাকালীন সেখানকার পরিবেশ, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে গারোপাহাড় এবং কাশফুলের নৈসর্গিক সাম্রাজ্যের বর্ণনা উঠে এসেছে তার কথোপকথনে। এছাড়া জয়নুল আবেদীনের সাথে রাত্রিযাপন, কামরুল হাসানের মতো গুণী মানুষের সান্নিধ্য, সে সবের সুখকর স্মৃতিচারণ হয়েছে সাবলীল। ক্রমান্বয়ে নাইব উদ্দিন আহমেদের স্মৃতি গিয়ে ঠেকেছে উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন উত্তাল মুহূর্তে। নাইব উদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকে তাঁর জীবনকালে দেখা শ্রেষ্ঠ ঘটনা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। মামার দেওয়া একটি বেবিব্রাউনি ক্যামেরা দিয়ে তিনি সে সময়কার প্রেক্ষাপটকে ধারণ করেছেন। তার আলোকচিত্র গ্রহণের শৈল্পিক পথচলার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত এই প্রামাণ্যচিত্রের কোথাও কোথাও সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি তুলে এনেছেন একাত্তরে বাংলাদেশের যুদ্ধাবস্থায় মানুষের জীবন এবং তাদের প্রতি হওয়া অত্যাচারের বিবরণ। মধুপুর ফরেস্টে বাঙালির ওপর হানাদার বাহিনীর সংঘটিত নির্যাতনের বেশ কিছু ছবি তোলা হয় মেজর কাইউমের ক্যামেরায়। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে নাইব উদ্দিন আহমেদ তা সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে সেই ছবি আমেরিকান গণমাধ্যমে প্রচার করার দুঃসাহসিক স্মৃতি তিনি বর্ণনা করেছেন। একই সাথে হালুয়াঘাট এবং গফরগাঁওয়ে তার ধারণকৃত নারী নির্যাতনের করুণ বাস্তবতারও উল্লেখ করেছেন তিনি। মধুপুর বাজারে তোলা তাঁর ছবির পরিপ্রেক্ষিতে মেজর বুখারী, পাকবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স কীভাবে তার ঘরে তল্লাশি চালায় সেই হয়রানির অভিজ্ঞতাও তার মনে এখনো সতেজ। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান, তাদের পরিচালিত যুদ্ধ থেকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা, ধর্ষিতা নারীর অসহায়ত্ব থেকে সৈনিকের বীরত্ব সবই তিনি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার ক্যামেরায়।

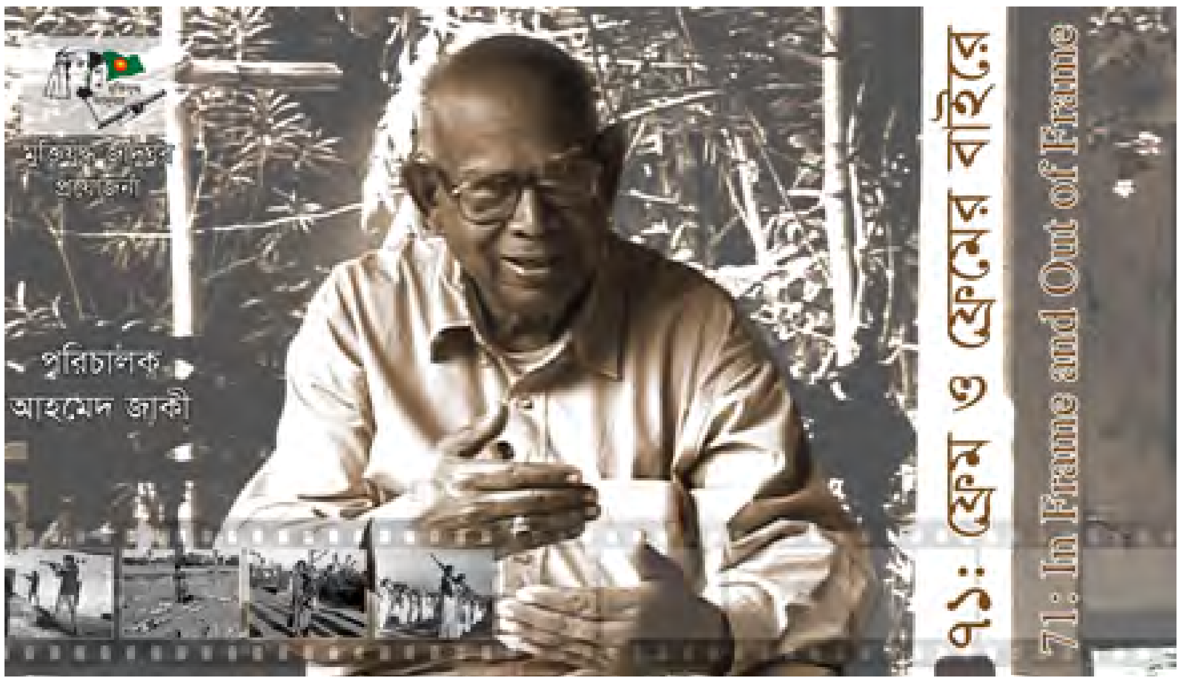

প্রামাণ্যচিত্র দেখুন এই লিংকে : https://www.youtube.com/watch?v=pUjQdSWivp0

নাইব উদ্দিন আহমেদের বক্তব্যে বোঝা যায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার ধারণকৃত ছবি বাংলাদেশের ইতিহাসকে ধারণ করে এবং তিনি তার বেশকিছু বিখ্যাত স্থিরচিত্রের পটভূমির বিবরণ তুলে ধরেছেন তার কথোপকথনে। বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হওয়া গণহত্যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে, যেখানে নারী, বৃদ্ধ, শিশুর কঙ্কাল আমাদেরকে জান-ান দেয় তাদের পরিণতির কথা। মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রী নাইব উদ্দিন আহমেদের স্থিরচিত্র বাঙালির উপর পরিচালিত বর্বরতা এবং একই সাথে তাদের বীরত্বের গল্পগাথা; যেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওয়ার পরেও তার রাইফেল হাতছাড়া করেনি। নাইব উদ্দিন আহমেদ স্মরণ করেছেন তাঁর স্থিরচিত্রের বীরপুরুষদের, যাদের ভেতরে অনেকেই শহিদ হয়েছে এবং যারা এখনো জীবিত। তাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তাঁর সাক্ষাৎ আমাদেরকে ভিন্ন আরেকটি গল্প শোনায়।

তার ধারণ করা একাত্তরের প্রতিটি ছবির পেছনে একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। যার কিছু আভাস পাওয়া যায় এই স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্রে। নিঃসন্দেহে এর প্রতিটি স্বতন্ত্র বীরত্বগাথা বাংলাদেশের জন্মের বাস্তব ইতিহাস; যা তিনি কোনো অপরাহ্নে একটি রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত বারো মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ডের এই তথ্যচিত্র একটি স্বতঃস্ফূর্ত, মেদহীন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যেখানে ব্যক্তি স্মৃতিচারণমূলক ছন্দে তার কর্ম এবং ঘটনার আলোকপাত ঘটেছে।

তথ্যচিত্রটিতে সংগীতের ব্যবহার বলতে থেমে থেমে আসা দোতারার সুর যা নজরুল ইসলাম যথার্থ নৈপুণ্যের সাথে সমন্বয় করেছেন। এটা প্রামাণ্যচিত্রটির মাধুর্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। 71:In Frame and Out of Frame একটি পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত পরিবেশনা যা আমাদেরকে নাইব উদ্দিন আহমেদের ধারণকৃত স্থিরচিত্রকর্মের সাথে পরিচয় করায়। এর প্রতিটি চিত্র আমাদের স্মরণ করায় উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অধ্যায়।

রুরুমুনি রায় মজুমদার
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে অনেক ভালো লেগেছে। জাতির অনেক কিছু জানার আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে। প্রত্যেকেরই উচিত জীবনে একবার হলেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভ্রমণ করা।

সুরভী/ ২৮.০৬.২৪

এক কথায় অসাধারণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণার স্থান। বর্তমান প্রজন্মের এই এক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ভালো জানতে পারবে।

টিমু/২৮.০৬.২০২৪

আমরা দুই বোন ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের ইংরেজি বইয়ে লিখা এই জাদুঘর সম্পর্কে। আমরা এখানে এসে সবকিছুর ব্যাপারে জানতে পেরেছি। আমি এখানে এসে খুব খুশি।

আরফাহ কাজী, শাওরী আর আফর কাজী, শাওদা/ ৩১.০৮.২০২৪

বাংলার স্মৃতিজড়িত ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধসহ আরো অনেক কিছু জানা ও দেখা এক অভূপূর্ব ভাগ্য এবং নিজ চোখে দেখে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়ানোর আরেক আনন্দ হলো ইতিহাস জানা।

তুহিন ও ইমন, টঙ্গী/ ০২.০৯.২০২৪

আগামীর আয়োজন

শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য

রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় চিৎকার করছে

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তরে আক্রমণ করে। তখন আমি চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে ওয়ার্কার্স ক্লাবে কর্মরত ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী চট্টগ্রাম হতে কাপ্তাই এবং চন্দ্রঘোনা আসার পথে কালুরঘাটে বাংলাদেশের আর্মি, পুলিশ, ইপিআর এবং আনসার বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। প্রায় ৩/৪ দিন কালুরঘাটে যুদ্ধ চলার পর চন্দ্রঘোনা পেপার মিল এলাকায় পাকবাহিনী পৌঁছে যায়। আমি এবং আমার এক ভাই সপরিবারে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে নারাংগিরীর পশ্চিমে এক গ্রামে আত্মগোপন করি। দিনে জঙ্গলে ও রাতে এক বাড়িতে আশ্রয় নেই। এভাবে ১০/১৫ দিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাটানোর পর গ্রামের পথ ধরে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হই। প্রায় এক সপ্তাহ এভাবে কাটানোর পর মে মাসের ১৬ তারিখে অতিকষ্টে চট্টগ্রাম পৌঁছি। তখন লোক মারফত জানতে পারি যে, চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রপথে জাহাজ বরিশাল আসা-যাওয়া করে। এর পূর্বে এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। একদিন চন্দ্রঘোনা বাসায় অবস্থানকালে দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। বাসাটি ছিল পেপার মিল এলাকার রাস্তার কাছে। হঠাৎ একটি ট্রাক মিল এলাকায় প্রবেশ করে। ট্রাকের ভিতর থেকে ঝর্না বেগে রক্ত রাস্তায় পড়ছে। তখন রাস্তার পাশে দাঁড়ানো লোকের কাছে কারণ জানতে চাইলে তারা বলে যে, কতগুলি লোক হত্যা করে মিলে মাটি চাপা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাই হোক চট্টগ্রাম সদরঘাট এসে দেখলাম যে, ঠিকই জাহাজ বরিশালের উদ্দেশে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাবে। আমরা সেই জাহাজে উঠে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বসে রইলাম। চট্টগ্রাম আসার পথে কর্ণফুলী নদীর প্রায় সমস্ত এলাকায় মানুষের মরা দেহ ভাসতে দেখলাম। আমাদের পরনে ছিল ছেড়া-ফাঁড়া কাপড় এবং সাথে পুরাতন বালিশ। মোট কথা সম্বলহীন মানুষের মত। মাঝে-মধ্যে পাক হানাদাররা দাঁড় করিয়ে নাম এবং পরিচয় জানতে চাইল। যখন আমি নামের পরে খান ব্যবহার করতাম তখনই বলত হট যাও। ১৯৭১ সালের ২৩ মে আমরা জাহাজযোগে বরিশাল এসে পৌঁছলাম। এখানে এসেও এক করুণ দৃশ্য নজরে পড়ল। দুটি যুবক ছেলেকে পাকবাহিনীর গাড়ির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। জানা গেল ঐ ছেলে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের নিকট নথি পত্র ছিল। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল কিনা জানি না। এদিকে জাহাজে উঠে আর এক করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। আমরা যেদিন এসেছি তার পূর্বের যাত্রাপথে গর্ভবতী এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয় এবং উক্ত মহিলার সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় চিৎকার করছে।

বাড়িতে অবস্থান কালের ঘটনা অনেক মনে পড়ে কিন্তু তারিখগুলি মনে নাই। একদিনের ঘটনা, বরিশালের কলাতামা গ্রামের আমার এক ফুফাতো ভাই কলেজের ছাত্র। একদিন রাত্রে মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা কাশিপুর এলাকায় একটি পুল ধ্বংস করে ফেলায় ওই ছেলেটি সকালবেলা দেখছিল কিভাবে পুলটি উড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে একটি জিপ গাড়িতে একদল পাকসেনা সেখানে এসে উপস্থিত। তখন ছেলেটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর পুনরায় সেখানে এসে ছেলেটিকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

সূত্র: জ ১৪৪৯৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রনী হোসেন মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ ৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, রোল: ২৯	**মো. আবদুল মালেক খান** গ্রাম: লাফাদি(পশ্চিম), পোস্ট: মাধবপাশা উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

পেলাম না আমার বাবাকে আর সমিকে

আমার জীবনে ভয়ংকর স্মরণীয় একটা ঘটনার কথা এখনো মনে পড়ে। এই ঘটনার কথা মনে হলে আমি এখনো শিউরে উঠি। সে দিন ছিল ১৭ মে। হঠাৎ করে রহিম চাচা চিৎকার করে বাবাকে ডাকতে শুরু করলেন। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে পিছু পিছু আমি আর ভাইয়া আসলাম। রহিম চাচা বলেন, মাস্টার সাহেব আগামীকাল আমাদের গ্রামে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ঢুকবে। তখন বাবা বলেন, এখন দেশের যে খারাপ অবস্থা... সারা দেশে যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানিরা যে অত্যাচার করছে... গ্রামগুলো সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। কত অসহায় মা বোনদের উপর অত্যাচার করছে। কত মায়ের বুক খালি করছে। তখন ভাইয়া বলে উঠল, আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে। বাবা রহিম চাচাকে বললেন, এক্ষুনি বাড়ি যাও। ভাইয়া মাকে ডেকে বললো, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

সকাল বেলা কিছু দেখা গেল না। বিকাল বেলা সবাই চেঁচামেচি করে যে যেখানে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। পাঁচ ছয়টা বড় বড় জিপে করে পাকিস্তানিরা এসে স্কুলের মাঠে ক্যাম্প গড়লো। পরের দিন রাতে শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। আমরা সকলে ভয়ে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলাম। পরে শোনা গেল মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের উপর হামলা করেছিল। এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর শুরু হলো পাকসেনাদের অত্যাচার। সবার ঘরে ঘরে পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘর-বাড়ি। নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করছে। অসহায় মায়ের সন্তানদেরকে মুক্তিবাহিনী বলে গুলি করে হত্যা করছে। রহিম চাচার ছেলেকে নিয়ে হত্যা করেছে। চাচা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। এই দিকে বাবা ভাইয়াকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একদিন রাতে বুটের শব্দ শোনা গেল পাশের বাড়িতে। খালেক চাচার মেয়ে রহিমার চিৎকার শুনতে পেলাম। বাবা-মা, আমি, সমি আমরা একটা ঘরের মধ্যে বসে থাকলাম। হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির উঠানে পাকিস্তানিরা এসে বাবাকে ডাকতে লাগল আর দরজায় লাথি মারতে লাগল। বাবা আমাদেরকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে বললেন মাকে। আমি আর মা যেই বের হয়ে আসলাম, সেই সময় আমাদের সামনের দরজা ভেঙে পাকিস্তানিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি আর মা পিছনের পুকুরের ভেতর লাফ দিয়ে কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম; কিন্তু সমি আর আসতে পারল না। পাকিস্তানিরা সমিকে ধরে ফেলে। আর বাবাকে বলতে লাগল, তোমহারা মুক্তিবাহিনী লাড়কা কাহা হে? বাবা বললেন, আমার ছেলে বেড়াতে গেছে। পাকিস্তানি বলে, তুমনে ঝুট কাহা, তুম ছাচ ছাচ বাতাও, নেহি তো তোমহারা লারকিকো ম্যায় লেজাউঙ্গি। বাবা বারবার বলেন যে, আমার ছেলে বেড়াতে গেছে। আমি একটুও মিথ্যা বলছি না। তখন বাবাকে গুলি করল আর সমিকে ওরা নিয়ে গেল। যখন চারপাশ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আর মা পুকুরের ভেতর থেকে উঠে এলাম। এসে দেখি বাবা গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। তাই দেখে আমার মা চিৎকার দিয়ে উঠলেন। সেই সময় বাবা মাকে বললেন, তোমরা তোমার বাবার বাড়িতে চলে যাও।

পরদিন সকালে আমরা নানা বাড়িতে চলে গেলাম। বাবার সেই হাহাকার আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রইল। এমনি কত হতাশার মাঝ দিয়ে কয়েকটি মাস কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমার ভাইয়া দেশ স্বাধীন করে ফিরে এলো। আমরা আবার আমাদের সোনার বাংলাকে ফিরে পেলাম– পেলাম না আমার বাবাকে আর সমিকে।

সূত্র : জ-২৬৭৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রোকসানা আক্তার স্বর্ণা বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয় নবম শ্রেণি রোল-৪০, শাখা-খ	**সামছুন নাহার** সম্পর্ক : মা গ্রাম+পোস্ট: বহরপুর, থানা: বালিয়াকান্দী, জেলা: রাজবাড়ী

গামছাটি বুকে জড়িয়ে তিনি কাঁদেন

আগস্ট ১৯৭১। রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বড়বনগ্রাম হাটের উপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি হায়েনারা। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে দোকানগুলিতে। গুলি করেও মেরেছে কয়েকজনকে। খবর ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত গ্রামে।

মকিম পাগল ভাত খেতে বসেছিল। মিলিটারির কথা শুনে ভাত রেখে গলার গামছায় কিছু গমভাজা নিয়ে চিবোতে চিবোতে ছুটলো হাটের দিকে। কি কাণ্ড! মিলিটারির ভয়ে গ্রামবাসী ছুটে পালাচ্ছে, আর মকিম কিনা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

মকিম পাগল তবুতো মানুষ। পাকিস্তানিদের মত জানোয়ার তো নয় যে গরিবদের কষ্টের দোকানগুলোকে বিনা কারণে পোড়াতে দেখেও চুপ থাকবে। সে একটি কলসি সংগ্রহ করে পাশের নদী থেকে (সিরাজপুরের হাওর) পানি নিয়ে আগুন নেভাতে গেল। পাগল বলে মিলিটারিরা ওকে সরিয়ে দিলেও সে বারবার আগুন নেভাতে উদ্যত হচ্ছিল। আর মুখে মিলিটারিদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছিল বিশ্রী গালাগাল– 'শালারা! তোদের বাপ দাদার ঘর যে ইচ্ছেমত পোড়াবি, ওইগুলি বানাতে আমাগো কষ্ট হয় নাই?'

মকিম কথা শুনছিল না। মিলিটারিরা ওকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল এবং শুইয়ে ছোরা দিয়ে তাকে পশু কোরবানির মত জবেহ করে ফেললো। তারপর দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল পানিতে।

এদিকে মকিমের মা মরিয়ম লোকের মুখে শুনে ছুটে গেল হাটের দিকে। কিন্তু ব্যর্থ তার সেই ছুটে যাওয়া, শুধু দেখলো ছড়ানো ছিটানো আগুনের চিহ্ন, বুটের লাল দাগ, ছিন্নভিন্ন কয়েকটি লাশ, নদীর ধারে মকিমের গলার গামছাটি, আর লাল রঙের শান্ত পানি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর শুধু চোখহীন মকিমের মাথাটি ছাড়া আজও কিছুই পাওয়া যায়নি।

চোখের পানিতে হয়তো নদীর পানি বেড়েছে, মরিয়ম অন্ধ হয়েছেন। তবুও পানি পড়ছে অবিরাম। মকিমের গলার সেই গামছাটি বুকে জড়িয়ে আজও তিনি কেঁদে চলেছেন।

সূত্র : জ-২৪৮৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নাজমুন নাহার মিশু পাংশা জর্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণি-দশম, বিভাগ: বিজ্ঞান, রোল-০১	**আঃ ছাত্তার বিশ্বাস** বয়স-৫৭, সম্পর্ক বাবা মুক্তিযোদ্ধা

সুলতানার স্বপ্ন ও আমার ভাবনা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ছোট্ট ইউনিয়ন পায়রাবন্দ। ৮ মে ২০২৪ বিশ্ববাসী পরিচিত হয়েছেন বাংলাদেশের এই ছোট্ট ইউনিয়নের নামের সাথে। পায়রাবন্দের গৌরবময় এই অর্জনকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং ইউনেস্কো ঢাকা দপ্তরের সহযোগিতায় 'বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র' রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করে 'সুলতানার স্বপ্ন ও আমার ভাবনা' শিরোনামে সৃজনশীল পাঠ প্রতিক্রিয়ার। স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগটি পরিচালনা করেন মণি-শংকর স্মৃতি পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের বিষয় উপলব্ধি করে তাদের পাঠ প্রতিক্রিয়াই কেবল ব্যক্ত করেনি, বরং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার যৌক্তিকতা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যকেও চিহ্নিত করেছে। এই সংখ্যায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের লেখার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার পাঠকদের জন্য।

মোছা : সাদিয়া জাহান তুবা
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : যমুনা, আইডি : ৫০

'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটি নিয়ে আমার ভাবনা:

তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের মানসিকতার দুর্বলতর দিকগুলোকে। এবং নারীদের মহত্তম দিকগুলো। তিনি সমাজকে অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিকে তোয়াক্কা না করে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা তথা কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। এরোপ্লেনে না চড়েও বায়ুশকটের কথা এবং জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা উপস্থাপন করেন। একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে থেকেও রোকেয়া একটা রাজ্য পরিচালনার সামগ্রিক দিককে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সুলতানার স্বপ্ন লেখাটায়। এ যেন এক স্বপ্ন যা প্রত্যেক নারী দেখে থাকে- তাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাবে, বিকশিত হতে পারবে নিজেরা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে পারবে, অবাধ সুযোগ সর্বোপরি ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে নিজেকে।

সমাজ সংগঠনে 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পের ভূমিকা : রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন আজকের সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। অনেকে বলে থাকেন রোকেয়া পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়েই নারীকে দেখেছেন। যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার বেড়ে ওঠা সেখানে এরকমটা হওয়া স্বভাবিক। কিন্তু 'সুলতানার স্বপ্ন'তে রোকেয়াকে ভিন্নভাবে আবিষ্কারের সুযোগ আছে। পুরুষতন্ত্রের গড়ে দেওয়া ছাঁচে নয় বরং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নারীকে দেখেছেন। এখানে তিনি নারীস্থানের স্বপ্ন দেখেছেন তা তো আসলে এক অর্থে নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার কথা বলেন। আজকের পৃথিবীর স্লোগানকে নিশ্চিত করার কথা বলেন। আজকের পৃথিবীর স্লোগানও তো তাই নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠা করার। রোকেয়ার চিন্তার আধুনিকতা এখানেই। তিনি তার সময়ের চেয়ে আরও সামনের অর্থাৎ একশত বছর পরের সমাজকে তুলে ধরেছেন। যে সমাজে অর্থনৈতিক সংকটও থাকবে না। প্রকৃতিকে বশীভূত করা হবে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করে। কেবল এখানেই নয় রক্তপাতহীন ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যাপারে নারীস্থান সদা তৎপর। সেখানে খরা এবং অতিবৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের সফল চেষ্টা করা হয়েছে। এটা আজকের সমাজে করা হচ্ছে। অথচ রোকেয়া অনেক আগে এমনটা বলে গেছেন। রোকেয়ার চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে একটা সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেতেই পারে।

মেধা আফরোজ আইডিয়াল পাবরিক স্কুল
শ্রেণি : নবম, রোল : ১

বিজ্ঞানমনস্ক রোকেয়া বৈষয়িক উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়নের গুরুত্বও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন, এ দুয়ের সংমিশ্রণ ব্যতীত প্রশান্তিময় জীবন গঠন সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই নারীস্থানে মহারাণীর আত্মিক উন্নয়ন এবং বৈষয়িক পরিমিতিকেই সকলের মন জয় করেছে। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে উঠে সত্যানুসন্ধান এবং জ্ঞান অর্জনই তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। তাই থানা-পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আদালতের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই সেই দেশে। 'সুলতানার স্বপ্ন'-তে মহারাণীর উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে, 'আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই-দশ বিঘা জমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা একখণ্ড হীরকের জন্য যুদ্ধ করি না– যদ্যপি তাহা কোহিনূর অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞান সাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি।' আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন–

'কল্পনা জ্ঞানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।
জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কল্পনা অসীম।'

রোকেয়া আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দীরও অধিক বছর পূর্বে যা কল্পনা করে গেছেন তা আজ সবই প্রাসঙ্গিক। তিনি সেই সময়ে বসে নারী মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন যেই সময় দিবা আলোতে মেয়েদের বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর অবদানেই আজ নারীরা দিবা আলোতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তাঁর অবদানেই নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আজ নারীরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। নারীরা আজ দেশের প্রধান মন্ত্রী হতে শুরু করে ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত হচ্ছেন। তবে এখনও গণধর্ষণের শিকার হয় নারীরা। জ্যোতি সিং-এর এক ধর্ষক সাফাই দেয়– 'মেয়েদের দোষ, তাদের ঘরের ভিতরে থাকা উচিত ছিল। এই সুলতানার স্বপ্নের অচেনা নারীর উক্তি আমাদের বিবেক হয়ে তাড়া দেয়, যদি ক্ষতিকর মানসিক অসুস্থ্য কিংবা হিংস্র পশুকে রুদ্ধ করে রাখা হয় তাহলে নারী-লোলুপ পশুরা কেন রুদ্ধ থাকবে না? এই উপন্যাসিকাটি নারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। আজ নারীরা আর কোনো অন্যায়কে আঁকড়ে ধরে মুখ বুজে চুপ করে নেই তারা আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম। এই মহিয়সী নারী কবি নজরুলের লেখা–

'বিশ্বে যা কিছু আছে মহান চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

এই চরণটিকে বাস্তবে রূপান্তর করেছেন। তাই তাঁকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। তিনি শুধু একজন নারীবাদী লেখকই নন. একজন বিজ্ঞান চেতনাশীল লেখকও তা আমরা তাঁর এই উপন্যাসিকাটি পড়লে খুব ভালোভাবেই অবগত হতে পারি। বেগম

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুলতানার স্বপ্ন ও আমার ভাবনা

unesco

Regional Committee

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

certifies the inscription of

"Sultana's Dream" by Rokeya S. Hossain

Liberation War Museum, Dhaka

Bangladesh

on the

Memory of the World Committee for Asia and the Pacific Regional Register

Kwibae Kim
Chair
MOWCAP

8 May 2024
Date

Jo Hironaka
Adviser/Chief of Unit
Communication & Information
UNESCO Bangkok

UNESCO Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP)

৪-এর পৃষ্ঠার পর

রোকেয়ার এই উপন্যাসিকাটি আমাকে কল্পনা করার প্রেরণা দেয়। নতুন কিছু ভাবার এবং উদ্ভাবনের মানসিকতাকে বাড়িয়ে দেয়। আমার কল্পনাশক্তিকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলে। আমাকে একজন বিজ্ঞান চেতনাশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়।

সুরাইয়া সালাহউদ্দিন
মিঠাপুকুর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠাপুকুর, রংপুর
শ্রেণি: নবম, শাখা : জবা, রোল : ১

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পুরুষকে হেয় করাই কি উদ্দেশ্য ছিল রোকেয়ার? তাদের আটকে রেখে কি নারীমুক্তি হতে পারে? উত্তর হলো- রোকেয়া আসলে নারীদের সামনে একটি উল্টো চিত্র হাজির করে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পুরুষকে দাবিয়ে রাখা দেখানো কোনো প্রতিশোধস্পৃহা নয় বরং নারীকে এ জীবন প্রত্যাখ্যান করার শক্তি জোগানোর চেষ্টামাত্র। আর নারী এই শক্তি অর্জন করতে পারে কেবল একটি পথে– শিক্ষা ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। এ পথেই রোকেয়া বরাবরই উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন নারীদের।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভাবতে অবাক লাগে। আজ থেকে ১১৯ বছর আগে ১৯০৫ সালে উপমহাদেশের একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও রোকেয়া একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন।... আজ শতবর্ষ পেরিয়েও যখন দেখি, অধিকার আদায়ে জড়ো হওয়া নারী শ্রমিকরা নিমিষে হাওয়া হয়ে যান চাকরি ও ঘর হারানোর বা অপবাদের ভয়ে; এমনভাবে সমাজে টিকে থাকেন যেন অদৃশ্য-অনাহূত; অকর্মণ্য স্বামীর লাথি-গুঁতো খেয়েও পড়ে থাকেন সংসার সামলানোর দায় নিয়ে; তখন মনে হয় এসব পুরুষকে আটকানোর মর্দানা থাকলে মন্দ হতো না। যখন অপহৃত-ধর্ষিতা কন্যা-ভগ্নি-জননীর মৃতদেহ পড়ে থাকে ক্ষেতে, জঙ্গলে বা রাস্তায়; আর সে অপরাধের দায় চাপে নৃশংস অপরাধের শিকার নারীর ঘাড়েই, যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় একবিংশ শতকে এসেও নারীর অধিকার খর্ব করা নিয়ে স্ট্যাটাস দেয়া হয়, তখন আমারও সুলতানার মতো স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে যে, এই ভয়াবহ অপরাধীদের কোথাও আটকে রাখতে পারলেই হতো রক্ষা!

যে সমাজে আজও সন্ধ্যার পর নারীদের বাইরে বেরোনো অপরাধ, সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যার প্রশ্ন তোলা পাপ, যে সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে আজও নারীদের অবলা, অপয়া প্রমাণ করে, গৃহে অন্তরীণ রাখাকে বাহবা প্রদান করা হয়, যেখানে আজও নারীবাদীদের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে, তখন সে সমাজ ছেড়ে আমারও প্রবল ইচ্ছা জাগে সুলনাতার স্বপ্নের মতো একটি নারীস্থান তৈরি করে সেখানে থাকার। যখন আমি সুলতানার স্বপ্ন বইটি পড়ছিলাম, তখন প্রতিটি লাইনে লাইনে আমার মনের ভেতরকার একরাশ অভিমান এবং সেই সাথে নতুন আশার সঞ্চার নতুন করে জেগে উঠেছিল এই ভেবে, 'সেদিন সুদূর নয়/যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।'

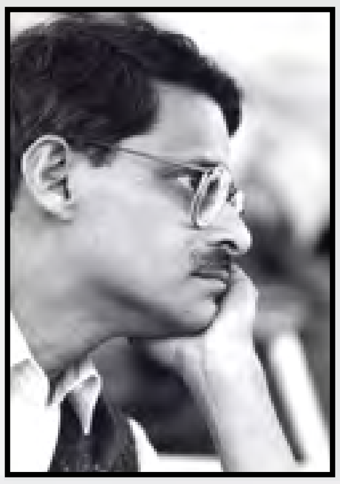

বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণ

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' হৃদয়ে ধারণ করে ২০২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তিনি চলে গেলেন অন্য ভুবনে। বাঙালি সত্তা ও সম্প্রীতির চেতনা প্রতিষ্ঠায় সদা-সংগ্রামী তারিক আলী রেখে গেছেন তাঁর কর্ম ও জীবনের আদর্শ। যেখানেই লাল-সবুজের পতাকা উড়ে, বেজে ওঠে জাতীয় সংগীতের সুর সেখানেই তিনি মূর্ত হন দেশপ্রেমের মূর্চ্ছনায়। জেগে ওঠে তাঁর কর্মপথের চিহ্ন। সেই প্রেরণায় চলবে আমাদের আগামীর পথচলা।

লিংক : https://www.facebook.com/reel/1496439757657360

মু | ক্তি | যো | দ্ধা | র || ভা | ষ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আব্দুল মজিদ

আমার বাড়ি নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার নাউতারা গ্রামে। ১৯৬৭ সালে ডিমলা উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়, এরপর আমার আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে। বাড়িতে বসে বেকার সময় পার করছিলাম। আমার এক ভগ্নিপতি নাম বাদশা মিয়া। যিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্য ছিলেন। পাকবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করলো। একই সাথে মকবুল নামের আমাদের এলাকার একজন প্রাক্তন আনসার কমান্ডারকে হত্যা করলো। আমার আপন চাচাকে বাড়িতে এসে আমাদের সামনে মারলো একদিন। এছাড়াও আমাদের আশেপাশে নানা মানুষজনের উপর তারা অন্যায় অত্যাচার শুরু করলো। এসব দেখে আমি আর সহ্য করতে পারিনি। জুলাই মাসের শুরুর দিকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে কিছু পাট এবং মোরগ নিয়ে বেরিয়ে যাই। পার্শ্ববর্তী বাজারে এসব বিক্রি করে তৎকালীন এমপি সাহেবের পুত্রের সহায়তায় দেওয়ানগঞ্জ যুবশিবিরে যুক্ত হই। এখানে দশ-বারো দিনে আমার মতো আরও অনেক যুবকরা জড়ো হওয়ার পর আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হলো ভারতে অবস্থিত রাজগঞ্জ যুবশিবিরে। সেখানেও দশ-বারো দিন থাকার পর আমাদের পাঠানো হলো মুজিব বাহিনীর মুরতি ক্যাম্পে। সেখানে আটাশ দিনের প্রশিক্ষণ হলো। এরপর আমাদের রণাঙ্গণে পাঠানো হলো ৬ নম্বর সেক্টরের বুড়িমারী হেডকোর্য়াটারে। তখন অক্টোবর মাস। শুরু হলো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ আমার। আমরা যুদ্ধ করেছি পাটগ্রাম, বড়কাথা, বাউলা ও হাতিবান্ধা। ওখান থেকে মাঝেমাঝে ডিমলার শুড়িবাড়ি যেতাম যুদ্ধ করতে। নদী পার হয়ে যেতে হতো। সেখানে একটা বড় বাজার ছিল যেখানে পাকবাহিনী মানুষের উপর অত্যাচার করতো। আমরা রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করতাম। এভাবে একমাস কেটে গেলো। ওই অঞ্চলের শেষ যুদ্ধ করেছিলাম হাতিবান্ধায়। সেখানকার পাকবাহিনীর ক্যাম্পটা ছিল একটা রেলস্টেশনের পাশে। টানা তিন-চার দিন যুদ্ধ হয়েছে। আমরা প্রথমে ওদেরকে ওখান থেকে হটাতে পারি নাই। আমরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামে গেলাম। তবে আমাদের পরের দলটা যখন আবার আক্রমণে গেলো, পজিশন নিয়ে ওরা গুলি করে কিন্তু কোন জবাব আসে না। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দেখি বাংকার ছেড়ে ওরা আগেই পালিয়ে গেছে। বাংকার থেকে একটা দশ-এগারো বছরের আধ মরা মেয়েকে উদ্ধার করা হলো উলঙ্গ অবস্থায়। আমরাও গেলাম ওখানে। এভাবে হাতিবান্ধা থেকে পাকবাহিনীকে হটানো হলো। তখন নভেম্বর মাস। তারিখ মনে নাই। তবে ওই মুহূর্তে পাকবাহিনীর রসদের সকল পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমাদেরকে ওইখান থেকে ক্লোজ করে যার যার নিজের এলাকা অভিমুখে আগাতে বলা হয়। আমাদের ডিমলার অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল– আবুল কাশেম, আব্বাস আলী, আতিয়ার রহমান, আজহারুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, আব্দুল হক, জয়নাল আবেদীন, তৈয়ব আলী, রফিকুল ইসলাম-সহ আমরা বিশ-বাইশ জন ছিলাম। আমরা একই কোম্পানির দুটি আলাদা সেকশনে ছিলাম। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন আব্দুস সাত্তার। আর আমার সেকশন কমান্ডার আমি নিজেই ছিলাম। আমরা নিজেদের এলাকা ডিমলার দিকে আগাতে থ াকলাম। প্রথমে চিলাহাটিতে এসে জড়ো হলাম সবাই। ক্যাপ্টেন ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে আমরা প্রথম দিনই যুদ্ধ শুরু করলাম। শুরু হলো সর্বাত্মক আক্রমণ। আমরা রাতের অন্ধকারে অবস্থান নিয়েছিলাম। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ফায়ার ওপেন করি। আমাদের পেছনে বাগডোগরা থেকে আর্টিলারি এবং মাথার ওপর দিয়ে মিত্র বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগ দিয়েছিল আক্রমণে। আমরা অগ্রভাগে থেকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। এভাবে দুদিন ধরে আমরা যুদ্ধ করতে থাকলাম। চিলাহাটি হয়ে ডোমার এসে দেখি পাকবাহিনী পালিয়েছে। আমরা ভাবলাম ওরা তরনিবাড়িতে আছে। গিয়ে দেখি ওখান থেকেও পালিয়েছে। পরে নীলফামারী রেল স্টেশনে এসে দেখি ওরা সৈয়দপুরের দিকে চলে গেছে। এভাবে সৈয়দপুরের আশপাশ ক্লিয়ার করে রণকৌশল অনুসারে আমরা সৈয়দপুর থেকে নীলফামারী ব্যাক করি। সেদিন ছিল ১৫ ডিসেম্বর। আমাদের উদ্দেশ্য আরও সংগঠিত হয়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা। পরের দিন আমরা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগুয়ান হলাম। কিন্তু দুপুরের দিকে খবর পেলাম ঢাকা শত্রু মুক্ত হয়েছে। পরে তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো। সৈয়দপুরে ওরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করতে চাইলো না ভয়ে। মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করলে ওরা ভেবেছিল প্রাণে বাঁচতে পারবে না।

সাক্ষাৎকার : শরীফ রেজা মাহমুদ

অবরুদ্ধ শহরে কবি : শামসুর রাহমান

পাকিস্তানী হানাদার দ্বারা অবরুদ্ধ শহরে কবি তার কবিতার খাতা করে তুলেছিল প্রতিরোধের হাতিয়ার পুরানো এক ডায়েরির পাতা শামসুর রাহমান ভরিয়ে তুলেছিলেন কবিতায় যা জাতির বেদনা ও প্রতিরোধের ছবি তুলে ধরেছিল

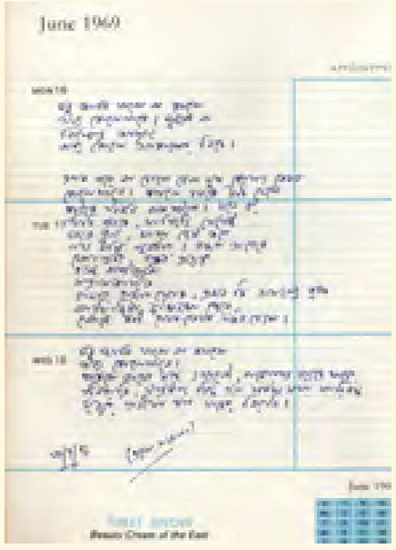

শরণার্থী শিবিরে শিল্পী

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাউল শিল্পী মো. জালাল দেওয়ানের দোতারা

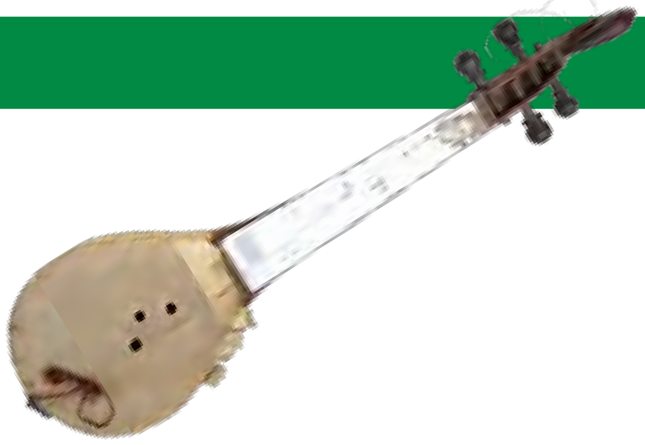

মুক্তিযোদ্ধা বাউল শিল্পী মো. জালাল দেওয়ান এই দোতারা বাজিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে জীবন-জাগানিয়া গান গেয়েছেন।

দাতা: মো. জালাল দেওয়ান

ভুলিনাই শহিদের কোনো স্মৃতি/ভুলবনা কিছুই আমরা

শহীদ অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব তালুকদার

আব্দুল ওয়াহাব তালুকদার ছিলেন কুড়িগ্রাম কলেজের অধ্যাপক। ৭১-এ তিনি ৬ নম্বর সেক্টরের বামনহাট যুবশিবিরের ইনচার্জ হিসেবে দারিত্বরত ছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ব্রাশফায়ার ও বেয়নেট চার্জে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে। ৭ আগস্ট ১৯৭১ তিনি শহিদ হন।

শহিদ অধ্যাপক আবদুল ওহাব তালুকদারের পরিধেয় রক্তাক্ত লুঙ্গি ও প্যান্ট

দাতা: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার

বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা...

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম রফিকুল হক

এ. কে. এম রফিকুল হক ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ ভারতে যান প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। সিমলা ও ইন্দ্রনগর ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শেষে প্রথমে ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় এবং পরে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরের আখাউড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেন। মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল হকের হ্যাভারস্যাক ও প্রশিক্ষণকালীন নোটবই

দাতা : এ.কে.এম রফিকুল হক, বীরপ্রতীক

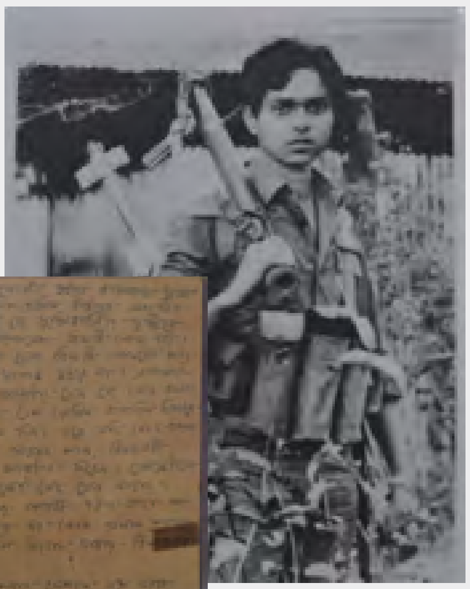

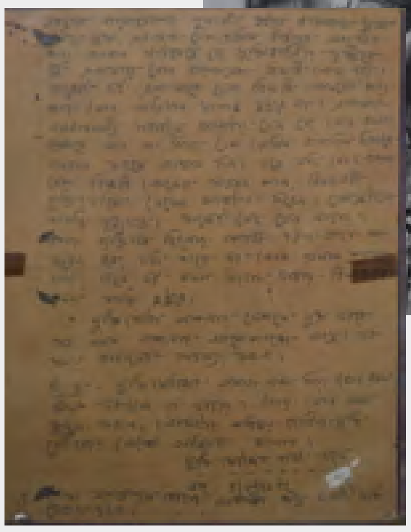

বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. মুত্তালিব খোকন

এম. এ. মুত্তালিব খোকন মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি এপ্রিলের শুরুর দিকে ভারতের মতিনগরে স্থাপিত ২ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পে গেরিলা প্রশিক্ষণে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি খালেদ মোশাররফ ও এ.টি.এম হায়দারের অধীনে কুমিল্লা ও বেলোনিয়ায় পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

দাতা : এম. এ. মুত্তালিব খোকন

শ্রদ্ধাঞ্জলি : একাত্তরের পদযাত্রী বীরযোদ্ধা অনিল কুমার বিশ্বাস

অনিল কুমার বিশ্বাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে যশোর, খুলনা, বগুড়া, ফরিদপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৮ তরুণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের বনগাঁ থেকে অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল-এর উদ্যোগে দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা : বাংলাদেশ হইতে দিল্লী' শীর্ষক ঐতিহাসিক লংমার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনিল কুমার বিশ্বাস ছিলেন সেই ৩৮ তরুণ দলের সহযাত্রী। এই বীরযোদ্ধা ২২ আগস্ট ২০২৪ ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে কোন সুহৃদ যখন যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। এই সুহৃদের সাথে পরিচয় অক্টোবর ২০১০ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা' দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। জাদুঘরের এই সুহৃদ অক্টোবর ২০১১ ও নভেম্বর ২০১৭-এ যশোর জেলায় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের' শুনিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীর ঐতিহাসিক লংমার্চের গল্প। সুহৃদ অনিল কুমার বিশ্বাসের সাথে মাঝে মাঝে ফোনালাপ হত এবং সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। ২০২২-এ নড়াইল জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি চলাকালে অনিল কুমার বিশ্বাসের সাথে ফোনালাপ হয়েছিল 'অসুস্থ সুভাস দাদাকে দেখতে আসব তখন দেখা হবে' কিন্তু হলো না। সদালাপী এই বীরযোদ্ধার সাথে নভেম্বর ২০১৯-এ দেখা হয়েছিল যশোরে আর এই দেখাই আমার সাথে শেষ দেখা। 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ' পদযাত্রী দলের সদস্য সদ্যপ্রয়াত বীর যোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

একাত্তরের শরণার্থী এবং একটি কবিতা

যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালির অহিংস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে থামাতে বেছে নেয় অস্ত্রের ভাষা, নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ চলে শহর থেকে গ্রামে, তখন নিরুপায় বাঙালি প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। ইতিহাস বলে একাত্তরে শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃসহ জীবনযাত্রা দৃষ্টি কেড়েছিল বিশ্বনেতাদের এবং বিশ্ববাসীর। বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসে শুরু হয় বিরাট মানবিক ত্রাণ সহায়তা। আজ থেকে ৫৩ বছর আগে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে আসেন মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। যদিও তিনি এসেছিলেন সরেজমিন শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন বহুল প্রচারিত মার্কিন মাসিক পত্রিকা 'রোলিং স্টোন'- এর জন্য। শরণার্থী শিবির ঘুরে এক বিষণ্ন অপরাধবোধ ছেয়ে যায় তাকে। এই বোধ থেকে, পৃথিবীর সব নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে সকল স্বৈরশাসক আর নিপীড়কের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে তার কলম থেকে তৈরি হলো এক কালজয়ী কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। ২০ নভেম্বর ১৯৭১ সেইন্ট জর্জ চার্চে আয়োজিত হয় এক কবিতা পাঠের আসর, আয়োজনের নাম দেয়া হয় 'বাংলাদেশের জন্য মার্কিনিরা'। এই আসরে কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ পাঠ করেন 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন সংগীত শিল্পী বব ডিলান। কবিতাটি তাকে এতটাই আপ্লুত করে যে তিনি পরবর্তীতে এতে সুরারোপ করেন।

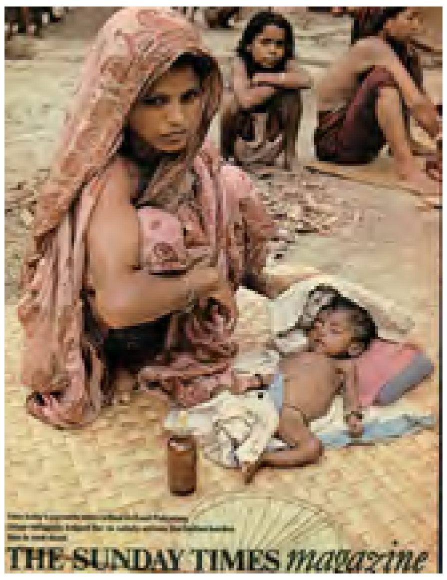

শতাব্দী প্রাচীন নিদর্শন– আমার সোনার বাংলা

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভের আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *আমার সোনার বাংলা* গানটির রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিককালে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়। সে বছর আগস্ট মাসের ৭ বা মতান্তরে ২৫ তারিখ কলকাতার টাউন হলে জনসম্মুখে প্রথমবারের মতো গানটি গাওয়া হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে। সেদিনকার বাঙালি সমাজ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই স্বদেশ পর্যায় গানের সুরারোপ করেন বাউল পদকর্তা গগণ হরকরার *আমি কোথায় পাব তারে*'র লোকসুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। যা গানটিকে এক অন্য মাত্রায় ব্যাঞ্জনাময় করে তোলে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরেও গানটি অখণ্ড বাংলার বাঙালিদের হৃদয়-মনে গেঁথে থাকে। তার প্রমাণ মিলে ১৯২৫-২৭ সালে বার্মার মান্দালয় জেলে বন্দী অবস্থায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর খাতায়। তিনি কারাগারে বসে বাংলা মায়ের স্মরণে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে রাখেন *আমার সোনার বাংলা* গানের একুশটি চরণ। যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ১ নম্বর প্রদর্শনালায় সংরক্ষিত আছে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় মুকুল ফৌজ, শিল্পী সংসদ, প্রান্তিক শিল্পীগোষ্ঠী, ধূমকেতু শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ, অগ্রণী শিল্পীগোষ্ঠী, খেলাঘর আসর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, কচিকাঁচার মেলা, ছায়ানট, ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার পরিষদ, উদিচী

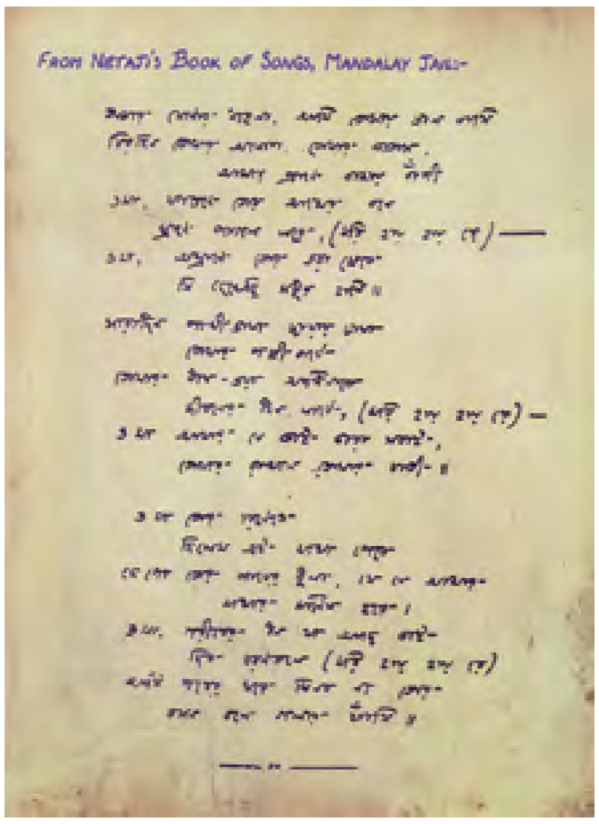
FROM NETAJI'S BOOK OF SONGS, MANDALAY JAIL-

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত সুভাষ চন্দ্র বসুর খাতায় লেখা রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা'

ও গণ-শিল্পীগোষ্ঠীর মতো অসংখ্য গণসংগীতের দল ও সাংস্কৃতিক সংসদের জন্ম হয়। এসব সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মসূচিতে ভাষা আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন অব্দি মুক্তিসংগ্রামী সকল প্রতিবাদ-প্রতিরোধে *আমার সোনার বাংলা* গানটি গণমানুষের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নেয়। এরমধ্যে মোটাদাগে উল্লেখ করার মতো ইতিহাস হলো ১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে তাৎপর্যপূর্ণভাবে *আমার সোনার বাংলা* পরিবেশিত হয়, ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা কর্মসূচি ঘিরে ঢাকার ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী কাউন্সিলের উদ্বোধন হয় *আমার সোনার বাংলা* পরিবেশনের মাধ্যমে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী *জীবন থেকে নেওয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে *আমার সোনার বাংলা* গানের ব্যবহার এদেশের গণমানুষের মুক্তিকামী চেতনায় বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩ মার্চ ১৯৭১ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পল্টনের জনসভায় *আমার সোনার বাংলা*কে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার দাবি আসে। এরপর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের আনুষ্ঠানিকতা বর্জনের অংশ হিসেবে টেলিভিশনে *আমার সোনার বাংলা* পরিবেশিত হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও *আমার সোনার বাংলা* গাওয়া হয় যথাযথ ভাবগাম্ভির্যে। একাত্তরের রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, প্রবাসী সরকারের দফতরসহ সর্বত্র *আমার সোনার বাংলা*কে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় গাওয়া হয়। সাত দশকের পথপরিক্রমা শেষে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি *আমার সোনার বাংলা* আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে।

শরীফ রেজা মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official